জীবন্ত স্বপ্ন

এইচ জি ওয়েলস

জীবন্ত স্বপ্ন

(A Dream of Armageddon)

লোকটাকে দেখেছিলাম রাগবি স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে। সাদা নিরক্ত মুখ। শ্লথ চরণ। কুলির দরকার, কিন্তু হেঁকে ডাকছে না কুলিকে। খুবই অসুস্থ মনে হয়েছিল। তাই চেয়েছিল একদৃষ্টে। পা টেনে টেনে এসে বসে পড়েছিল আমার পাশে। পাঁজর গুড়ো করে যেন বেরিয়ে এসেছিল দীর্ঘশ্বাসটা। গায়ের শালটা কোনওমতে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে শূন্য চাহনি মেলে তাকিয়েছিল অন্যদিকে। একটু পরেই অস্বস্তি জাগ্রত হয়েছিল অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, আমার নিষ্পলক চাহনি তার ওপরেই নিবদ্ধ রয়েছে বুঝতে পেরে। বারেক তাকিয়েছিল আমার দিকে। পরক্ষণেই ফের চোখ মেলেছিল আমার ওপর।

বই পড়ে যাওয়ার ভান করেছিলাম আমি। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে বিড়ম্বনায় ফেলেছি, এই আশঙ্কায় আর তার দিকে তাকাইনি। অবাক হয়েছিলাম একটু পরেই। কী যেন সে বলছিল আমাকে।

কিছু বলছেন? জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি।

আঙুল তুলে আমার হাতের বইটা দেখিয়ে সে বলেছিল, স্বপ্ন সংক্রান্ত বই, তা-ই না?

নিশ্চয়, ড্রিম স্টেটস নামটা তো প্রচ্ছদেই লেখা রয়েছে।

চুপ করে ছিল সে কিছুক্ষণ। যেন বলার মতো কথা খুঁজছে মনের মধ্যে। তারপর বলেছিল আত্মগত স্বরে, কিন্তু ওরা তো কিছু বলবে না আপনাকে।

মানে বুঝলাম না। তাই নীরব রইলাম।

সে বললে, জানলে তো বলবে।

খুঁটিয়ে দেখছিলাম তার মুখচ্ছবি। সে বলেছিল, স্বপ্ন আছে বইকী–বিলক্ষণ আছে।

এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করি না আমিও।

দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে সে তখন বলেছিল, স্বপ্ন দেখেন? মানে, জীবন্ত স্বপ্ন?

বলেছিলাম, স্বপ্নই দেখি কম। বছরে তিনটেও হয় কি না সন্দেহ।

আবার চিন্তায় ডুবে গিয়েছিল সে। যেন কথা সাজাচ্ছে মনের মধ্যে।

তারপরেই প্রশ্ন করেছিল আচমকা, স্মৃতি আর স্বপ্ন কি তালগোল পাকিয়ে যায়? স্বপ্ন আদৌ সত্যি বলে মনে হয় কখনও?

কদাচিৎ। ক্ষণেকের জন্যে দ্বিধা জাগে মাঝেমধ্যে। সবারই তা-ই হয়।

বইতে কী লিখছে?

লিখছে, মনের মধ্যে গভীর চাপ পড়লে স্বপ্নে তার প্রকাশ ঘটতে পারে। স্বপ্নের তীব্রতা থেকেই বিচার করে নেওয়া যায় স্বপ্নদৃশ্য সত্যি কি না। অনেক অনুমিতি আছে এ ব্যাপারে। জানেন নিশ্চয়।

সামান্যই জানি। তবে সব কটা অনুমিতিই যে ভুল, সেটা জানি বেশ ভালো করেই।

শীর্ণ হাত বাড়িয়ে জানলার ফিতে ধরে নাড়তে লাগল সে। দেখে, ফের তুলে নিলাম। বইটা। অমনি সে ঝুঁকে পড়ল আমার দিকে। বই পড়া আর হল না পরবর্তী প্রশ্নে।

ধারাবাহিক স্বপ্ন বলে কিছু আছে কি? এমন স্বপ্ন, যা চলে রাতের পর রাত?

আছে বলেই তো মনে হয়। মানসিক রোগ সংক্রান্ত বহু বইতে এ ধরনের স্বপ্নের বৃত্তান্ত আছে।

মানসিক রোগ! হয়তো তা-ই। মনই তো উপযুক্ত ক্ষেত্র। কিন্তু আমি যা বলতে চাই, কথা থামিয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল নিজের অস্থিময় আঙুলের গাঁটের দিকে, এ ধরনের স্বপ্ন কি বারে বারে ফিরে আসে? সত্যিই কি এর নাম স্বপ্ন? অন্য কিছু নয় তো?

ছিনেজোঁকের মতো কথা চালিয়ে যাওয়ার জন্যে নির্ঘাত দাবড়ানি দিয়ে বসতাম। সামলে নিলাম শূন্যগর্ভ চাহনি আর রক্তিম ঠোঁট দেখে। এ চাহনির অর্থ যারা বোঝবার, তারা বোঝে।

চুপ করে আছি দেখে সে বলেছিল, আপনার মতামতের জন্য তর্ক করছি ভাববেন না যেন। মরতে বসেছি এই স্বপ্নের জ্বালায়! তাই

স্বপ্নের জ্বালায়?

জানি না তাকে স্বপ্ন বলবেন কি না। রাতের পর রাত চলছে এই উৎপাত। জীবন্ত স্বপ্ন। এত জীবন্ত যে, সেই তুলনায় রেললাইনের ধারে ওই ল্যাম্পপোস্টগুলোকেও মনে হয়। অবাস্তব! তখন কিন্তু আর মনেই পড়ে না কে আমি... কী আমার কাজ...

আটকে গেল কথা। একটু পরে–এই এখনই ধরুন-না কেন...

সব স্বপ্নই একই, এই তো বলতে চান? আমার প্রশ্ন।

সব শেষ... সব শেষ।

মানে?

আমি মারা গেছি।

মারা গেছেন?

রাতের পর রাত জেগে উঠেছি এই পৃথিবীরই অন্য এক অঞ্চলে, অন্য এককালে–স্বপ্নের মধ্যে। রাতের পর রাত জাগরণ ঘটেছে অন্য এক জীবনধারার মধ্যে। রাতের পর রাত নতুন নতুন ঘটনা, নতুন নতুন দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে আমাকে। তারপর

একদিন সব শেষ হয়ে গেছে। খুন হয়ে গিয়েছি। স্বপ্ন বলতে এখন যা রয়েছে তা মড়ার স্বপ্ন। চিরমৃত্যু আচ্ছন্ন করে রেখেছে আমাকে। শেষ দৃশ্যটা

মানে আপনার মৃত্যুর দৃশ্য?

হ্যাঁ, আমার মৃত্যুর দৃশ্য।

তারপর থেকে

না, আর নেই। স্বপ্ন খতম হয়েছে সেইখানেই।

বেশ বুঝলাম, উদ্ভট এই স্বপ্নকাহিনি আমাকে না শুনিয়ে ছাড়বে না লোকটা। হাতে অবশ্য সময় আছে পুরো একটা ঘণ্টা।

বলেছিলাম, অন্য এককালে জীবনযাপনের কথা কী বলছিলেন, বুঝলাম না। কাল মানে কী বলতে চাইছেন, অন্য একটা যুগ? অন্য শতাব্দী?

হ্যাঁ।

অতীতে?

না, না, সে যুগ আসবে।

তিন হাজার খ্রিস্টাব্দ কি?

কত খ্রিস্টাব্দ, তা তো বলতে পারব না। মনে ছিল স্বপ্নের মধ্যে জাগরণের সময়ে। এখন ভুলে গেছি। তা ছাড়া, সাল-শতককে ওরা খ্রিস্টাব্দের হিসেবেও প্রকাশ করে না। কী যেন বলে– বলে, কপালে হাত রেখে মনে করার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল সেনাঃ, একদম মনে পড়ছে না।

ক্লিষ্ট হাসি ভেসে ওঠে ঠোঁটের কোণে। ক্ষণেকের জন্যে মনে হয়েছিল, স্বপ্নবৃত্তান্ত আমাকে শোনানোর আদৌ কোনও বাসনা হয়তো নেই। স্বপ্নের কথা যারা চেপে যায়, দুচক্ষে তাদের দেখতে পারি না আমি। কিন্তু এ ব্যাপারটা মনে হচ্ছে সেরকম নয়। আমার সহযোগিতা দরকার। তাই বলেছিলাম, ধরুন—

জীবন্ত... প্রথম থেকেই। হঠাৎ যেন ঘুম ভেঙে যায় নতুন এক জীবনের মধ্যে। তখন কিন্তু এই জীবনের কিছু মনে পড়ে না। অদ্ভুত, তা-ই না? মনে হয় যেন স্বপ্নের আয়ু যতক্ষণ, ততক্ষণ যা কিছু ঘটছে, তা-ই যথেষ্ট। স্বপ্নের জীবনের বাড়তি আর কোনও জীবন নিষ্প্রয়োজন। হয়তো, নাঃ, গোড়া থেকেই বলা যাক। দেখাই যাক-না, কতখানি মনে করতে পারি। হঠাৎ নিজেকে দেখি, একটা বাগানের মধ্যে বসে আছি, সামনে সমুদ্র। এর আগেকার কোনও ব্যাপারই মনে পড়ছে না। ঢুলছি। আচমকা তন্দ্রা ছুটে গেল। যেন স্বপ্ন নয়, সত্যি সত্যিই আধঘুম থেকে জেগে উঠলাম। কারণ আর কিছুই নয়। যে মেয়েটা বাতাস করছিল হাতপাখা দিয়ে, তার হাত আর চলছে না, গায়ে হাওয়া লাগছে না।

মেয়েটা?

হ্যাঁ, সেই মেয়েটা। কথার মাঝে কথা বলবেন না। সব ভুলে যাব।

বলতে বলতে সে থমকে গেল আচমকা, পাগল ভাবছেন না তো?

না তো। স্বপ্ন দেখছিলেন। বলে যান, কী দেখছেন।

তন্দ্রা ছুটে গেল মেয়েটা বাতাস করা থামিয়েছে বলে। অবাক হচ্ছি না হঠাৎ এমন একটা জায়গায় নিজেকে দেখে। আচমকা সেখানে পৌঁছে গেছি বলেও মনে হচ্ছে না। ঘুম ভাঙল, ঠিক সেইখান থেকেই সহজভাবে শুরু হয়ে গেল জীবনের ধারা। ঊনবিংশ শতাব্দীর যা কিছু স্মৃতি, ভাবীকালের সেই জীবনে মিলিয়ে গেল মন থেকে তৎক্ষণাৎ। এ যুগের কোনও ছাপই রইল না চিন্তার মধ্যে। আমার এখানকার নাম কুপার, তা-ও মুছে গেল চেতনা থেকে। জেগে রইল কেবল সেই যুগে আমার যা নাম, যা সামাজিক অবস্থান

কী নাম?

হেডন।

হেডন।–তারপর?

স্বপ্ন ছুটে যাওয়ার পর অনেক কথাই কিন্তু মনে নেই। ঘটনাগুলো পরপর ঠিকমতো মনে পড়ছে না। তখন কিন্তু জ্ঞান ছিল টনটনে... উদ্ভট মনে হচ্ছে না তো?

একেবারেই না। চালিয়ে যান। বাগানটা কীরকম বলুন।

বীথি বলা যায়–মামুলি বাগান নয়। সঠিক নামটা বলা সম্ভব নয়। দক্ষিণমুখো। ছোট্ট। ছায়াচ্ছন্ন। বারান্দার মাথার ওপর আধখানা চাঁদের মতো ফাঁক দিয়ে কেবল দেখা যাচ্ছে আকাশ, সমুদ্র। কোণে দাঁড়িয়ে সেই মেয়েটা। আমি বসে রয়েছি একটা ধাতুর তৈরি কৌচে –ডোরাকাটা গদির ওপর। বারান্দায় হেলান দিয়ে আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই মেয়েটা। সূর্য উঠছে। আলো পড়েছে তার কানে আর গালে। ঢেউখেলানো চুল লুটিয়ে রয়েছে ভারী সুন্দর সাদা কাঁধে। পেছনে সূর্য থাকায় শীতল নীলাভ ছায়া লুটিয়ে রয়েছে সাদা কাঁধে। পোশাকের বর্ণনা দেওয়াটা একটু মুশকিল। জবরজং কিছু নয়–সহজ সুন্দর। উচ্ছল প্রপাতের মতোই ঢল নেমেছে যেন গা বেয়ে। এককথায় বলা যায়, তার সৌন্দর্য মনকে টানে টানছিল আমাকেও। তাই দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলাম। মাথা তুলেছিলাম। সে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল আমার পানে।

আমার বয়স তিপ্পান্ন এই যুগে। আমার মা আছে, বোন আছে, বন্ধু আছে, স্ত্রী আছে, মেয়ে আছে। তাদের প্রত্যেকের মুখের ছবি জ্বলজ্বল করছে মনের মধ্যে, কিন্তু সবচেয়ে বাস্তব মনে হচ্ছে এই মেয়েটার মুখের ছবি। স্মৃতির পটে ফুটিয়ে তুলতে পারি ইচ্ছে করলেই–ছবি এঁকেও ফেলতে পারি, এত স্পষ্ট। তা সত্ত্বেও

স্তব্ধ হল বিচিত্র সহযাত্রী। আমি বাগড়া দিলাম না। চেয়ে রইলাম।

সে বললে, স্বপ্নে দেখা মুখ। তবুও তা সত্যি... অনেক বেশি সত্যি। সুন্দরী নিঃসন্দেহে। কিন্তু ভয়ানক নিরুত্তাপ সৌন্দর্য নয়, এ সৌন্দর্যের উদ্দেশে অর্ঘ নিবেদন করতে মন চায়– তাপসিক রূপরাশি বতে যা বোঝায়, তা-ই। ধমনিতে কামনার তুফান তোলে না– রক্তে আগুন ধরিয়ে দেয় না। স্নিগ্ধ দ্যুতিবর্ষণ জুড়িয়ে দেয় হৃদয়-দহনকে, মিষ্টি ঠোঁটের

নরম হাসি আর শান্ত গম্ভীর ধূসর চোখের চাহনি পেলব প্রলেপ দিয়ে যায় অস্থিরচিত্তে। তার ঘুরে দাঁড়ানো, তার ঘাড় বাঁকানো, তার বাহুভঙ্গিমা–সবকিছুর মধ্যেই এমন একটা সুকুমার ছন্দ

বলতে বলতে যেন কথা হারিয়ে ফেলল স্বপ্নকাতর মানুষটা। মাথা হেঁট করে বসে রইল কিছুক্ষণ। মাথা তোলার পর মুখচ্ছবিতে দেখলাম পরম স্বস্তিবোধ। গল্পের বাস্তবতায় যেন হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে, গোপন করার প্রয়াসও নেই মুখের পরতে পরতে।

জীবনের যা কিছু উচ্চাশা, সবই ছেড়ে এসেছি শুধু এই মেয়েটির জন্যে। পেয়েছি অনেক, চাওয়ারও রয়েছে অনেক কিছু–কিন্তু চাওয়া-পাওয়া সবই হেলায় ত্যাগ করেছি শুধু এই পরমাসুন্দরীর জন্যে। উত্তর অঞ্চলের জনগণের শীর্ষে ছিলাম। ছিল প্রভাব, প্রতিপত্তি, যশ, অর্থ, বিপুল সম্পত্তি। ওই রূপসির পাশে নিষ্প্রভ, অকিঞ্চিৎকর, তুচ্ছ মনে হয়েছে জীবনের এতগুলো পাওয়া। তাকে নিয়ে চলে এসেছি রোদ্দুর ঝলমলে আনন্দ উচ্ছল এই শহরে জীবনের শেষটুকু শান্তিতে কাটাতে। অনেক পরিকল্পনা ছিল, ছিল বিস্তর উচ্চাকাঙ্ক্ষা–ছিটেফোঁটাও এখন আর নেই মনের মধ্যে। বাহুবলে আর বুদ্ধিবলে অর্জিত সবকিছুই বিসর্জন দিয়েছি জীবনের গণ্ডি থেকে–শুধু এই মেয়েটিকে কাছে পাওয়ার জন্যে। তার ভালোবাসা পেয়েছি, পাব আমৃত্যু, সেই হোক আমার পরম বিত্ত, বাকি যা কিছু ঐশ্বর্য, মিলিয়ে যাক ধরণির ধুলায়, নশ্বর এই সংসারে অমর তো কেবল প্রেম... অক্ষয়, অব্যয়, অম্লান। আমার হৃদয় জুড়ে থাক কেবল সেই ভালোবাসা, বাকি সবকিছুই মনের মরীচিকা, মিথ্যে অহংকারের প্রাসাদ, যাক-না মিলিয়ে ভোরের কুয়াশার মতো। রাতের পর রাত এই ছিল আমার একমাত্র আকাক্ষা, আত্যন্তিক যাচ, নিষিদ্ধকে পাওয়ার উদগ্র বাসনা।

কিন্তু কোনও পুরুষেই পারে না মনের এই আবেগ আর-এক পুরুষের মনে সঞ্চারিত করতে। এ যেন একটা রঙের আভাস, একটা রশ্মির ঝলক, আসে আর যায় চকিতে। উপলব্ধি করা যায় সত্তা দিয়ে, ব্যক্ত করা যায় না ভাষা দিয়ে। ধরা যায় না, কেবল টের পাওয়া যায় পরিবর্তনের পর পরিবর্তন পালটে দিয়ে যাচ্ছে দিগন্ত থেকে দিগন্তব্যাপী মনের আকাশকে।

তাই তো আমি ত্যাগ করেছি ওদের সব্বাইকে, ফেলে এসেছি মহাসংকটের মধ্যে, সুরাহা কর গে নিজেরাই, যা পারে।

ঝরনাধারার মতো হেঁয়ালির পর হেঁয়ালির আবির্ভাবে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলাম আমি। – কাদের কথা বলছেন? কাদের ফেলে এলেন মহাসংকটের মধ্যে?

উত্তর অঞ্চলের মানুষ তারা। আমাকে শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে, আমার কথায় প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পারে। লক্ষ লক্ষ মানুষ আমাকে চোখেও দেখেনি, কিন্তু তবুও তাদের চোখে আমি একটা বিরাট পুরুষ। অসীম আস্থা আমার ওপর। বিশাল এই দেশ জুড়ে ষড়যন্ত্র আর হানাহানি, বিশ্বাসঘাতকতা আর উত্তেজনা চলছে বছরের পর বছর। রুখে দাঁড়িয়েছি আমি। ভয়ানক খেলা খেলে এসেছি বছরের পর বছর। অরাজকতা চরমে পৌঁছেছে একটা সংঘবদ্ধ দুষ্টচক্রের দাপটে। এদের বিরুদ্ধে দেশের মানুষ সংঘবদ্ধ হতে পেরেছে আমাকে ঘিরে। আমি তাদের শ্রদ্ধেয়, বরেণ্য, আস্থাভাজন নেতা। সাধারণ মানুষের ভাবাবেগ আর বোকামির সুযোগ নিয়েছে এই দুষ্টচক্র, চোখধাঁধানো বিরাট বিরাট পরিকল্পনা আর গালভরা কথাবার্তা দিয়ে ধোঁকা দিয়ে চলেছে বছরের পর বছর দেশের মানুষকে, রসাতলে যেতে বসেছে গোটা দেশটা। সে দেশের বর্ণময় পূর্ণ চিত্র

আপনার সামনে তুলে ধরা সম্ভব নয়। অনেক জটিল, অনেক বক্র। স্বপ্নের মধ্যে কিন্তু অনুপুঙ্খ চিত্র ধরা পড়েছিল আমার মনের আকাশে। কেউ বলে দেয়নি, করাল কুটিল এই দুষ্টচক্রের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছি আমি, কিন্তু আমি তা নিমেষে জেনেছিলাম তন্দ্রা ভেঙে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। ঢুলুনির মধ্যেও ভাবছিলাম বলেই চোখ রগড়ে নিয়ে ভাবনার রেশ ধরে মনকে বুঝিয়েছিলাম, ভালোই করেছি হানাহানির ওই নোংরা পরিবেশ থেকে রোদ্দুর ঝলমলে এই শহরে সরে এসে, ওই তো দাঁড়িয়ে আমার মনের মানুষ, শুধু যাকে নিয়েই আমি সুখী হতে পারব শেষ জীবনটায়। প্রেম আর সৌন্দর্য, আকাঙ্ক্ষা আর আনন্দের এই জগৎই প্রকৃত জগৎ, দ্বন্দ্ব আর সংঘর্ষময় নিরানন্দ জীবনের শেষে যত বিরাট প্রাপ্তিই থাকুক না, এর তুলনায় তা কিছুই নয়। মুগ্ধ চোখে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলেছিলাম আপন মনে, সব ছেড়েও সব পেয়েছি শুধু তোমাকে পেয়ে।

আনন্দোচ্ছল কণ্ঠে সে ডেকেছিল আমাকে–এখানে এসো-না, দেখে যাও কী সুন্দর সূর্য উঠছে মন্টি সোলারোতে।

লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছিলাম ডাক শুনেই। দেখেছিলাম, সাদা চুনাপাথরের পাহাড় ঝলমল করছে ভোরের আলোয়। তার আগে অবশ্য মুগ্ধ হয়েছিলাম মেয়েটির সুন্দর কাঁধে আর গালে সকালের রোদের বিচিত্র খেলা দেখে। ক্যাপ্রিতে দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য বর্ণনা করার ভাষা আমার নেই–

ক্যাপ্রি! মন্টি সোলারো! সোল্লাসে বাধা দিয়েছিলাম আমি, আরে, আমি তো উঠেছি মন্টি সোলারোর পাহাড়ে। চুড়োয় বসে ভেরো ক্যাপ্রিও খেয়েছি। কাদার মতো ঘোলাটে, সিডার সুরার মতো তেজালো অদ্ভুত ভেরো ক্যাপ্রির স্বাদ তো ভোলবার নয়।

যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল নিরক্তমুখ সহযাত্রী–যাক, আপনি তাহলে দেখেছেন। আমি কিন্তু আজও জানি না কোথায় সেই ক্যাপ্রি দ্বীপ–যাইনি জীবনে। গোটা দ্বীপটা একটা বিরাট হোটেল। অজস্র ছোট ছোট ঘর চুনাপাথরের গা খুদে তৈরি। সমুদ্র থেকে অনেক উঁচুতে। এত বড় আর এত জটিল হোটেল এ যুগে কেউ কল্পনাও করতে পারবে না বলেও আপনাকে বোঝাতে পারব না। দ্বীপের একদিকে মাইলের পর মাইল ভাসমান হোটেল আর ভাসমান মঞ্চ–উড়ুক্কু যানের অবতরণ মঞ্চ। এ যুগে তার কিছুই দেখতে পাবেন না।

আমরা দাঁড়িয়ে আছি অগুনতি ঘরের একটা ঘরে। অন্তরিপের শেষ প্রান্তে। দেখা যাচ্ছে পূর্বদিক আর পশ্চিমদিক। পূর্বে রয়েছে একটা বিশাল খাড়াই পর্বত-হাজারখানেক ফুট উঁচু তো বটেই। ধূসর রং–নিরুত্তাপ শীতল। একটা দিক কেবল সোনালি হয়ে রয়েছে সকালের রোদ পড়ায়। পর্বতের ওদিকে দেখা যাচ্ছে সাইরেন দ্বীপপুঞ্জ–বিলীয়মান উপকূলরেখা। পশ্চিমে চোখ ফেরালে দেখা যায় ছোট্ট একটা উপসাগর। এখনও ছায়া ঘনিয়ে রয়েছে বালুকাময় সৈকতে। ছায়াগর্ভ থেকে উন্নতশিরে দাঁড়িয়ে সোলারো পর্বত। সোনা-রোদে সোনালি চুড়ো। পেছনে সাদা চাঁদ। পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত বহুরঙা সমুদ্রে ভাসছে পালতোলা নৌকো-অজস্র।

পূর্বদিকের নৌকোগুলো তখনও ধূসর কিন্তু স্পষ্ট–পশ্চিমদিকেরগুলো যেন সোনা দিয়ে তৈরি–জ্বলছে ছোট ছোট আগুনের শিখার মতো। আমাদের ঠিক নিচেই একটা পাথরের খিলানের মধ্যে দিয়ে সবুজ আর সাদা ফেনা ছড়িয়ে বেরিয়ে আসছে একটা পাল আর দাঁড়ওয়ালা লম্বাটে নিচু জাহাজ।

ফ্যারাগলিওনি, বাধা না দিয়ে পারলাম না। পাথরের খিলানটার নাম ফ্যারাগুলিওনি। ডুবতে বসেছিলাম ওই সবুজ আর সাদা ফেনার মধ্যে

সায় দিলে নিরক্তমুখ লোকটা–হ্যাঁ, ঠিক নামই বলেছেন। ফ্যারাগলিওনি। মেয়েটার মুখে শুনেছি। একটা গল্পও বলেছিল। গল্পটা... গল্পটা... রগ টিপে কিছুক্ষণ মনে করার চেষ্টা করে–নাঃ, মনে পড়ছে না।

যাক গে, প্রথম স্বপ্নকাহিনিটাই বরং বলা যাক। কিচ্ছু ভুলিনি। ফিসফিস করে কথা বলছিলাম দুজনে–আমি আর সেই মেয়েটা। ঘরে আর কেউ ছিল না। তবুও কথা বলছিলাম গলা নামিয়ে। কারণটা আর কিছুই না–কাছাকাছি হয়েও যেন মনুকে মেলে ধরার মতো ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

খিদে পেল একটু পরেই। অদ্ভুত একটা অলিন্দ পেরিয়ে পৌঁছালাম প্রাতরাশ খাওয়ার বিরাট ঘরে। অদ্ভুত অলিন্দ এই কারণে যে, সেখানকার মেঝে দিয়ে হাঁটতে হয় না–শুধু দাঁড়িয়ে থাকতে হয়–মেঝে গড়িয়ে যায় আপনা থেকে।

প্রাতরাশ ঘরে উপচে পড়ছে আনন্দ আর হাসি। বাজছে তারের বাজনা। রোদ্দুর ঠিকরে যাচ্ছে ফোয়ারা থেকে। টেবিলে বসে হাসিভরা মুখে দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে তন্ময় হয়ে রইলাম রকমারি খাবার নিয়ে। তাই খেয়াল করিনি, অদূরে টেবিলে বসে একটি লোক একদৃষ্টে চেয়ে আছে আমার দিকে।

খাওয়া শেষ করে গেলাম নাচের ঘরে। সে ঘরের বর্ণনা দিই কীভাবে, ভেবে পাচ্ছি না। বিরাট ঘর। এ যুগের বিরাটতম প্রাসাদের চেয়েও বিরাট সেই একখানা হলঘর। অনেক

উঁচুতে মাথার ওপরে রয়েছে প্রস্তর-বীথিক্যাপ্রির তোরণ। বড় বড় থাম থেকে মেরুজ্যোতির মতো অজস্র ধারায় ঝুলছে সোনার সুতো। অজস্র সুন্দর প্রস্তরমূর্তি, অদ্ভুত ড্রাগন, সূক্ষ্ম জটিল কিম্ভুতকিমাকার স্ট্যাচুর গা থেকে ঠিকরে পড়ছে বিচিত্র আলো। দিনের আলোও ম্লান হয়ে যাচ্ছে ঘরের কৃত্রিম আলোকপ্রভায়। হাজার হাজার নরনারী পাশ দিয়ে যেতে যেতে সসম্ভ্রমে দেখছে আমাকে আর আমার পাশের মহিলাকে। আমাকে সবাই চেনে, শ্রদ্ধা করে। নাম-যশ-দ্বন্দ্ব ত্যাগ করে প্রমোদ-দ্বীপে চলে এসেছি শুধু এই রূপসির সঙ্গকামনায়–এইটুকুই কেবল এরা জানে। সবটুকু জানে না–অথবা বিভিন্ন রটনাই কেবল শুনেছে–তবুও আমার প্রতি শ্রদ্ধা-সম্ভমে চিড় খায়নি এতটুকু।

হাজার হাজার নাচিয়ে আশ্চর্য রঙিন ডিজাইনের পোশাক পরে গোল হয়ে নাচছে। মূর্তিগুলো ঘিরে। হাজার হাজার নরনারী খোশগল্প করছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, অথবা পানাহারে হাসি-মশকরায় উল্লোল করে তুলেছে নাচের ঘর। হাজার হাজার যুবক-যুবতী দল বেঁধে হাসতে হাসতে ঢুকছে ঘরে-হুঁল্লোড় করে বেরিয়ে যাছে ঘর থেকে। বাজছে অদ্ভুত সুরেলা বাজনা–এ যুগের কোনও বাজনদার মন-ভরিয়ে-তোলা সেই সুরের ইন্দ্রজাল কল্পনাও করতে পারবে না। সে ঘরে কেবল হাসি আর গান, সুর আর নাচ, আনন্দ আর উল্লাস ছাড়া আর কিছু নেই।

আমরা হাত ধরাধরি করে নাচলাম। নাচিয়েরা দুপাশে সরে গিয়ে জায়গা করে দিলে। প্রগলভতা নেই আমার সুন্দরী সঙ্গিনীর নাচের ছন্দে। আছে শুধু অতলান্ত গভীরতা–শান্ত মিষ্টি হাসি আর চাহনির মধ্যে আছে আরও অনেক কিছু, যা শুধু উপলব্ধি করা যায় হৃদয় দিয়ে।

হলঘরে আসবার সময়ে লক্ষ করেছিলাম অদূরে টেবিলে আসীন লোকটাকে। নির্নিমেষে চেয়ে ছিল আমার পানে। চোখে চোখ রাখিনি।

নাচ শেষ করে যখন সঙ্গিনীকে নিয়ে বসেছি নিরালায়–সেই লোকটা আমার বাহু স্পর্শ করে জানালে, কথা আছে। এখানে নয়, নিরিবিলিতে।

আমি বলেছিলাম, যা বলবার, এঁর সামনেই বলা হোক। বলুন কী চান? লোকটি তখন বলেছিল, উত্তর অঞ্চলে আমার নেতৃত্ব নিতান্তই দরকার হয়ে পড়েছে। দল যে ভেঙে যেতে বসেছে দ্বিতীয় নেতা এক্সহ্যামের অবিচক্ষণতায়। যুদ্ধ ঘোষণা করে ফেলেছে ঝোঁকের মাথায়। বুদ্ধির সূক্ষ্মতা তার কোনওকালেই নেই। এই আশঙ্কাটাই। করেছিল সবাই আমাকে ছাড়তে চায়নি এই কারণেই।

শুনতে শুনতে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছেটা মাথাচাড়া দিয়েছিল মাথার মধ্যে। সাংগঠনিক ক্ষমতা যে আমার শিরা-উপশিরায়–নতুন করে দলের মধ্যে শক্তিসঞ্চারের নেশায় তাই চনমন করে উঠেছিলাম।

তারপরেই চোখ পড়েছিল সঙ্গিনীর নীরব মুখের দিকে। আমি তো জানি, এখন উত্তর অঞ্চলে ফিরে যাওয়া মানেই বিচ্ছেদ

লোকটা জানত, আমার মনে এ দ্বিধা আসবেই। তাই নতুন করে কথার জাল বিছিয়ে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিল–

কিন্তু আমি আর কথা বাড়াতে দিইনি। বিদায় জানিয়েছিলাম।

যাবার সময়ে সে শুধু একটা কথাই বলে গেল–যুদ্ধ।

নীরবে বসে রইলাম দুজনে। অনেকক্ষণ পরে সঙ্গিনী বললে, যুদ্ধ যদি লাগে, তোমার তো ফিরে যাওয়াই উচিত। দল ভেঙে যেতে বসেছে

বুঝিয়ে বলেছিলাম, যুদ্ধ লাগছে শুধু এক্সহ্যামের হঠকারিতার জন্য। এটা যদি বুঝে থাকে দলের আর সবাই, এক্সহ্যামকে সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা তারাই করুক-না কেন। আমার যাওয়ার দরকার নেই।

এরপর গেলাম সমুদ্রস্নানে। স্নান শেষে ফিরে এলাম ঘরে–সে আর আমি। ঢুলুনি এসেছিল। হঠাৎ যেন বেহালার তারে টংকার জাগল–তন্দ্রা ছুটে গেল। দেখলাম, লিভারপুলে নিজের খাটে শুয়ে আছি, এই যুগে।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে কেবলই মনে হয়েছিল, স্বপ্ন নয়–যা কিছু ঘটে গেল, সব সত্যি। দাড়ি কামাতে কামাতে, স্নান করতে করতে কেবলই ভেবেছি, এক্সহ্যামের অবিমৃশ্যকারিতার জন্য অ্যামি কেন সুন্দরী সাহচর্য ছেড়ে ফিরে যাব উত্তরাঞ্চলে? স্বপ্ন দেখার পর এভাবে কেউ কিন্তু ভাবে না। বিশেষ করে আমার পক্ষে এমন ভাবাটা নিতান্তই হাস্যকর। কারণ, পেশায় আমি আইনজীবী। অথচ, ঘুরে-ফিরে স্বপ্নদৃশ্য মনে পড়ছে নিখুঁতভাবে। এমনকী, টেবিলের ওপর রাখা আমার স্ত্রী-র একখানা বইয়ের প্রচ্ছদে সোনালি বর্ডার দেখে মনের মধ্যে ভেসে উঠল নাচের ঘরের থাম থেকে মেরুজ্যোতির মতো ঝুলে-থাকা সোনার সুতোগুলোর দৃশ্য। এত সুস্পষ্টভাবে স্বপ্নদৃশ্য কেউ কি মনে করতে পারে?

মাথা নেড়ে বললাম, না, পারে না।

লিভারপুলের নামী আইনবিদ আমি। মক্কেলদের ভিড়েও কিছুতেই ভুলতে পারিনি, আজ থেকে হাজার দুয়েক পরে এক প্রেমিকার সাহচর্য উন্মনা করে রেখেছে আমাকে– দুহাজার বছর পরে আমার সন্তানসন্ততিদের হঠকারিতা নিয়ে বিচলিত রয়েছি সারাদিন। নেতৃত্ব আর সাংগঠনিক শক্তি যার সহজাত, অবিচক্ষণ নেতার অদূরদর্শিতায় সে উতলা রয়েছে প্রতিটি মুহূর্তে। সেইদিনই একটা নিরানব্বই বছরের বিল্ডিং লিজ নিয়ে দারুণ কথাকাটি হয়ে গেল মক্কেলের সঙ্গে। মাথা গরম হয়ে যাওয়ার ফলেই বোধহয় স্বপ্নটা আর দেখেনি। পরের রাতেও ফিরে আসেনি জীবন্ত স্বপ্নদৃশ্য। ভাবলাম বুঝি, স্বপ্নই দেখেছি তাহলে। নিতান্তই অলীক ব্যাপার। সত্যতা বা বাস্তবতার নামগন্ধও নেই। তারপরেই আবার আবির্ভাব ঘটল আশ্চর্য স্বপ্নের।

এবার এল চার রাত্রি পর। এই চার দিন চার রাত স্বপ্নদৃশ্যও ফুরিয়েছে, অনেক ঘটনা ঘটে গেছে ওর মধ্যে। স্বপ্নে জাগরণের ঠিক পরেই আমি গুম হয়ে বসে ছিলাম সেইসবের ভাবনায়, চমক ভাঙল সুন্দরী সঙ্গিনীর গলা শুনে। ডাকছে আমার নাম ধরে।

দেখলাম, দুজনে পাশাপাশি হাঁটছি প্রমোদ-শহরের বাইরে, এসে পড়েছি মন্টি সোলারোর চুড়োর কাছে, দূরে দেখা যাচ্ছে উপসাগর। তখন বিকেল গড়িয়ে এসেছে। অনেক দূরে বাঁদিকে দেখা যাচ্ছে সোনালি কুয়াশার মধ্যে ইশচিয়া, পাহাড়ের বুকে নেপলস, সামনেই ভিসুভিয়াসের চুড়ো থেকে ধোঁয়া উড়ে যাচ্ছে দক্ষিণদিকে, দেখা যাচ্ছে। টোরি অ্যাম্বুজিয়াটা আর ক্যাস্টেলামারের ধ্বংসস্তূপ।

চকিতে বললাম, ক্যাপ্রি গেছেন নিশ্চয়?

গেছি–স্বপ্নের মধ্যে। স্বপ্নের মধ্যেই দেখেছি উপসাগরে ভাসমান প্রাসাদের পর প্রাসাদ, নোঙর-বাঁধা অবস্থায়। উত্তরদিকে দেখেছি এরোপ্লেন নামবার ভাসমান মঞ্চের পর মঞ্চ, বিকেল হলেই প্রমোদসন্ধানীরা হাজারে হাজারে এসে নামছে এরোপ্লেনে করে।

এইসব দেখছি আর ভাবছি, কেন এক্সহ্যামের নির্বুদ্ধিতার নিরশন ঘটাতে উত্তরাঞ্চলে যাব আমি। আমিও মানুষ–আমারও সুখের প্রত্যাশা আছে। আমাকে যারা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে, তারা তাদের সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির জন্যেই ডাকছে আমাকে। আমার স্বার্থ আমি দেখব না কেন? মানুষের মতো বাঁচার অধিকার তো আমার আছে।

চিন্তার সুতো ছিঁড়ে গেল এরোপ্লেনের গর্জনে। চারখানা বিশালকায় অদ্ভুতদর্শন যুদ্ধবিমান খেলা দেখাচ্ছে শূন্যে। এক্সহ্যামের নির্বুদ্ধিতার অন্যতম নিদর্শন। চিরকালই ও এইরকম। চমক লাগিয়ে লোকের মন কেড়ে নেয়। বুদ্ধির কুশলতা নেই বলে ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে। বিমান মহড়া দেখিয়ে সাধারণ মানুষের চোখে নিজেকে শক্তিমান করে তোলার এই প্রয়াসে গা জ্বলে গেল আমার। যুদ্ধবিমানগুলো তৈরি হয়েছিল অনেকদিন আগে-যুদ্ধে কখনও নামেনি। অস্ত্রবিশারদদের তৈরি বহু বিধ্বংসী অস্ত্রই এখন গাদায় পড়ে। সাধারণ মানুষ পাট চুকিয়ে দিচ্ছে অস্ত্রশস্ত্রের। নির্বোধ এক্সহ্যাম তা সত্ত্বেও শক্তি প্রদর্শন করে চলেছে আকাশে-বাতাসে। ওর গর্ব খর্ব করতে পারি আমি এখুনি। উত্তরের মানুষ আমাকে ছাড়া কাউকে নেতা বলে মানে না। পূর্বের আর দক্ষিণের মানুষের কাছে উত্তরের মানুষ বলতে কেবল আমিই। সবাইকে একজোট করতে পারি আমি চক্ষের নিমেষে। কিন্তু কেন করব? কেন আমার মনের মানুষকে ছেড়ে নিরর্থক এই দ্বন্দ্ব রাজনীতির মধ্যে ছুটে যাব?

যার জন্যে যেতে চাই না, সে কিন্তু কাঁদতে কাঁদতে রাতের পর রাত আমাকে বুঝিয়েছে –ফিরে যেতে বলেছে উত্তরে, বৃহত্তর স্বার্থে, দেশের লোকের স্বার্থে।

কথাগুলো মনে পড়তেই কীরকম যেন হয়ে গেলাম। দুহাতে ওকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে নেমে এলাম পাহাড়ের গা বেয়ে। যারা আমাকে চেনে, তারা অবাক হয়ে গেল কাণ্ড দেখে। ভ্রূক্ষেপ করিনি আমি। পেছনে শুনলাম উড়ুক্কু যুদ্ধ-যন্ত্রযানের প্রচণ্ড ধাতব শব্দ।

দেখতে কীরকম মেশিনগুলো? প্রশ্ন করেছিলাম কৌতূহলী হয়ে।

বর্শার ফলার মতো–ডান্ডাটা কেবল নেই। গোলা বেরয় পেছনের ডান্ডার জায়গা থেকে – সামনের ফলাটা ঢু মারার জন্যে। গতিবেগ প্রচণ্ড। উড়ন্ত গাছের পাতা বলা যায়।

কী দিয়ে তৈরি?

লোহা নয়।

অ্যালুমিনিয়াম?

তা-ও নয়। খুব মামুলি একটা ধাতু-তামা-পিতলের মতো সব জায়গায় পাওয়া যায়। নামটা... নামটা... আবার রগ টিপে ধরে মনে করার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিলে নিরক্তমুখ সলিসিটর–নাঃ, কিছুতেই মনে পড়ছে না।

যা-ই হোক, ফিরে যাওয়ার শেষ সুযোগটা ছেড়ে দিলাম কীভাবে, এবার তা শুনুন। হাঁটতে হাঁটতে দুজনে যখন ফিরে এলাম প্রমোদ-শহরে, তখন আকাশে তারা দেখা যাচ্ছে। ছাদে বেড়াতে বেড়াতে চোখের জলে সঙ্গিনী আমাকে বারবার মিনতি করেছিল উত্তরে ফিরে যেতে। নইলে যে যুদ্ধ লাগবেই, দেশে দেশে জমিয়ে রাখা অস্ত্রের ভাঁড়ার খালি হবেই–পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি নিজেও তা জানি বইকী। দক্ষিণের নেতারা একজোট হয়ে এভ্রহ্যামের ধাপ্পাবাজির উচিত জবাব দিয়েছে গরম গরম ভাষায়। তামাম এশিয়া, সব কটা মহাসাগর থমথম করছে আসন্ন শেষ বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে। ঘন ঘন হুঁশিয়ারি যাচ্ছে ইথার আর তারের মধ্যে দিয়ে সাজ-সাজ রব উঠেছে সারা পৃথিবীতে।

কিন্তু আমি যাব না–কিছুতেই না। কথায় আমার সঙ্গে সে পারেনি। বুঝিয়ে দিয়েছিলাম কেন আমি যাব না। যদি তার মৃত্যু হয়, আমারও মৃত্যু হোক তৎক্ষণাৎ।

ফিরে যাওয়ার শেষ সুযোগটা হাতছাড়া করলাম এইভাবেই।

তারপর গেছে তিনটে সপ্তাহ–স্বপ্নে জাগরণ ঘটতে লাগল ঘন ঘন। এই তিনটে হপ্তার প্রায় প্রতিরাত্রে স্বপ্নই আমার একমাত্র জীবন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার চাইতেও বেশি কষ্ট গেছে, যে রাতগুলো স্বপ্নহীন অবস্থায় কেটেছে। ছটফট করেছি বিছানায় শুয়ে, অভিশপ্ত এই জীবনে, আমার জীবন্ত স্বপ্নের জীবনে তখন কিন্তু সময় বয়ে চলেছে ঘটনার পর ঘটনার মধ্যে দিয়ে, ভয়াবহ ঘটনাপরম্পরার বিন্দুবিসর্গ জানতে পারিনি, বিষম উদ্‌বেগে বিনিদ্র রাত্রি কাটিয়েছি যে কী কষ্টে, তা শুধু আমিই জানি।

ভাবনার মধ্যে কিছুক্ষণ তলিয়ে রইল সলিসিটর।

তারপর বললে, রাতের বেলায় স্বপ্নের মধ্যে জাগরণের মুহূর্তে যা যা ঘটেছে, সব আপনাকে খুঁটিয়ে বলে যেতে পারি, প্রতিটি ব্যাপার মনে পড়ছে, কিন্তু দিনের বেলায় কী যে ঘটেছে, কিছুতেই তা মনে করতে পারি না। অনেক চেষ্টা করেছি, বিদ্রোহী থেকেছে স্মৃতি বরাবর

ঝুঁকে পড়ে দুহাত জড়ো করে বেশ কিছুক্ষণ নিশ্চুপ অবস্থায় বসে রইল নিরক্তমুখ মানুষটা।

তারপর কী হল বলুন, জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি।

হারিকেন ঝড়ের মতো যুদ্ধ ফেটে পড়ল পৃথিবীময়।

অবর্ণনীয় এক দৃশ্যের পানে যেন চেয়ে রইল সে বিস্ফারিত চোখের শূন্য চাহনি মেলে।

বলুন? তাড়া লাগিয়েছিলাম আমি।

আত্মগত সুরে সে বললে, অবাস্তবতার ঈষৎ ছোঁয়াকেই লোকে বলে দুঃস্বপ্ন। কিন্তু আমি যা দেখেছি, তা দুঃস্বপ্ন নয়... না, না, তা দুঃস্বপ্ন নয়... কিছুতেই নয়!

আবার নীরবতা। ভয় হল, কাহিনির শেষের অংশে নিশ্চয় বীভৎস ঘটনাপরম্পরার জন্যেই মুখ খুলতে চাইছে না নিরক্তমুখ সহযাত্রী। আমিও আর তাড়া না লাগিয়ে চাবি এঁটে রইলাম মুখে। অচিরেই অবশ্য শুরু হয়ে গেল স্বগতোক্তি।

পালিয়ে যাওয়ার কোনও প্রশ্ন ওঠেনি। ভেবেছিলাম, যুদ্ধের আওতার বাইরে থাকবে ক্যাপ্রি। কিন্তু দুরাত যেতেই যুদ্ধ-পাগল হয়ে উঠল গোটা দ্বীপটা। খেপে গেল দ্বীপের প্রতিটি মানুষ। উৎকট গলাবাজিতে কানে তালা লেগে যাওয়ার উপক্রম হল বললেই চলে। প্রতিটি পুরুষ, প্রতিটি নারীর বুকে ঝুলতে দেখলাম এক্সহ্যামের ব্যাজ। ব্যাজ না-পরার জন্যে আমার সঙ্গিনীর ওপরেই ঝাজিয়ে উঠল এক মহিলা। বুঝলাম, আমার সময় খতম হয়ে গেছে। ব্যাজের দাম এখন অনেক বেশি–আমার চেয়ে। মানুষের গাদাগাদি, কানের কাছে যুদ্ধ-সংগীতের উন্মত্ত অট্টরোল-কাঁহাতক আর সওয়া যায়।

সঙ্গিনীকে নিয়ে ফিরে এলাম নিজের ছোট্ট ঘরে। অপমানিত, লাঞ্ছিত, নিগৃহীত হয়েও মুখ খুলতে পারলাম না। যে সুযোগ হারিয়েছি, আর তো তা ফিরে আসবে না। নিষ্ফল ক্রোধে ফুলতে লাগলাম ছোট্ট বন্দিশালায়। রক্তহীন সাদা মুখে নীরবে শুধু চেয়ে রইল আমার সঙ্গিনী। ঝগড়া করতেও পিছপা হতাম না, যদি এ অবস্থার জন্যে সামান্যতম দোষারোপও শুনতে হত সেই সময়ে।

খানদানি চালচলনের কিছুই আর অবশিষ্ট ছিল না আমার মধ্যে। প্রস্তর কারাগারে পায়চারি করেছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা আর দেখেছি, কালো সমুদ্রের ওপর দিয়ে আলোর ঝলক ছুটে যাচ্ছে দক্ষিণের আকাশে মিলিয়ে যাচ্ছে দেখতে দেখতে।

বারংবার বলেছিলাম–আর নয়, এবার পালাতে হবে। এ যুদ্ধে আমার কোনও ভূমিকা নেই–থাকবেও না। শান্তি যখন নেই এ দ্বীপে, চল, তখন চলে যাই।

পরের দিন বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের খপ্পর থেকে পলায়ন করেছিলাম দুজনে। দূরে... দূরে অনেক দূরে।

কত দূরে?

জবাব নেই।

কদ্দিন লেগেছিল পালাতে?

সে নিরুত্তর। মুখ সাদা। হাত মুষ্টিবদ্ধ। আমার কৌতূহল তাকে আর স্পর্শও করছে না।

পালিয়ে গেলেন কোথায়?

কখন?

ক্যাপ্রি থেকে বেরিয়ে?

দক্ষিণ-পশ্চিমে। নৌকোয় করে।

এরোপ্লেন নিলেন না কেন?

সব এরোপ্লেনই তখন যুদ্ধ-পাগলদের হাতে।

আর প্রশ্ন করা সমীচীন বোধ করলাম না। একটু পরে সে যেন নিজের মনের সঙ্গেই তর্ক চালিয়ে গেল আত্মগত সুরে।

কেন এই যুদ্ধ? কেন এই রক্তক্ষয়? কেন জীবন নিয়ে হানাহানি? ভালোভাবে জীবনটাকে উপভোগ করব বলেই তো সরে এসেছিলাম যুদ্ধ থেকে ভালোবেসে বাঁচতে চেয়েছিলাম, ঢলঢলে দুটো চোখের মধ্যে নতুন জীবনের ছবি দেখেছিলাম, সুন্দর একটা মুখের মধ্যে জীবনের আহ্বান স্পন্দিত হতে দেখেছিলাম। কিন্তু তার বদলে কী পেলাম? যুদ্ধ আর মৃত্যু!

স্বপ্ন ছাড়া তো কিছু না।

স্বপ্ন! দপ করে জ্বলে উঠেছিল সে–এখনও বলবেন এর নাম স্বপ্ন!

সেই প্রথম দেখলাম, প্রচণ্ড প্রাণশক্তির প্রলয়ংকর বিস্ফোরণ ঘটল যেন তার মধ্যে। দুহাত মুঠো পাকিয়ে শূন্যে তুলে ফের নামিয়ে নিল হাঁটুর ওপর। চোখ ফিরিয়ে নিলে আমার দিক থেকে। বাকি কথাগুলো বলে গেল অন্যদিকেই চেয়ে।

প্রেতচ্ছায়ার মতোই অনেক বাসনা-কামনা ঘিরে রয়েছে আমাদের। প্রেতচ্ছায়ার মধ্যে প্রেতচ্ছায়ার মতোই এগিয়ে চলেছি আমরা দিনের পর দিন। আলো আর ছায়ার মতো বাস্তবতা আর অবাস্তবতার দোলায় দুলে যাচ্ছি নিরন্তর। একটা বিষয় কিন্তু স্বপ্ন নয়। মোটেই, কখনও নয়। যা আমার জীবনের কেন্দ্রবিন্দু, আর সবকিছুই তুচ্ছ, নগণ্য, অকিঞ্চিৎকর এই কেন্দ্রবিন্দুর কাছে। সব মিথ্যে, সব ফাঁকা! কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে আমার সঙ্গিনী, যাকে আমি ভালোবাসি, আমার স্বপ্নের সেই সঙ্গিনী, যাকে নিয়ে বাঁচতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পারিনি। মারা গেছি দুজনেই!

স্বপ্ন! যে স্বপ্ন একটা জীবন্ত মানুষের দিবস-রজনির প্রতিটি মুহূর্তে বিষম যাতনায় ভরিয়ে রাখে, তাকে কি স্বপ্ন বলা যায়? স্বপ্নের শোকের যন্ত্রণা জাগরণে একজনকে এইভাবে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খাক করে দিতে পারে? তবুও বলবেন এর নাম স্বপ্ন?

সঙ্গিনী নিহত হওয়ার মুহূর্ত পর্যন্ত আশা ছিল, পালিয়ে বেঁচে যাব। নৌকোয় যাওয়ার সময়ে দেখেছিলাম যুদ্ধসাজে সজ্জিত ক্যাপ্রিকে। সাদা পাথরের অজস্র জানলা আর তরুবীথি-সমারোহ দেখে তখনও শান্তির নিকুঞ্জ বলেই মনে হয়েছিল দ্বীপটাকে। তারপরে চোখে পড়েছিল বিরাট বিরাট হাতিয়ার। উত্তরে-দক্ষিণে-পূর্বে দেখেছিলাম বর্শাফলকের আকারে ধাবমান বিমানশ্রেণির ছুটোছুটি। এ্যাম নিশ্চেষ্ট নেই–ধেয়ে যাচ্ছে পূর্বে। পূর্বের বিমান ধেয়ে যাচ্ছে উত্তরে। দক্ষিণ থেকেও আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে বিমান। বিশালকায় পাখির দঙ্গল পঙ্গপালের মতো ছেয়ে ফেলেছে আকাশকে। যুদ্ধে মেতেছে সারা পৃথিবী।

ডাঙায় পায়ে হেঁটে যেতে গিয়ে বাধা পেয়েছি পদে পদে। পকেটে অর্থ নেই–আমার পরিচয়েরও আর কোনও দাম নেই। সঙ্গিনীর নিগ্রহ-সম্ভাবনায় কারও কাছে। দাক্ষিণ্যপ্রত্যাশীও হইনি। ঘন ঘন কামান নির্ঘোষ শুনেছি দক্ষিণ-পশ্চিমে। চোরের মতো গা ঢেকে আমরা এগিয়েছি শুধু উত্তরদিকে। পথকষ্ট ক্লান্ত করেছে সঙ্গিনীকে, কষ্ট কাকে বলে, জীবনে সে জানেনি, তবুও মুখ ফুটে কখনও তা ব্যক্ত করেনি। খিদের জ্বালা মুখ বুজে সহ্য করে গেছে। ছিন্ন পোশাকে ধুলোয় আর নোংরায় আমাদের চেহারা পর্যন্ত পালটে গেছে। পালাচ্ছে চাষিরাও। ধরা পড়ছে সৈন্যদের হাতে, চালান করছে সেনাশিবিরে। মতলব ছিল, আবার একটা নৌকো নিয়ে সমুদ্রে ভাসব, কিন্তু তা আর হল না। যুদ্ধ গিলে নিল আমাদের দুজনকেই।

বেশ বুঝেছিলাম, দুদল সৈন্যের মাঝে পড়ে গিয়েছি। লড়াইয়ের ঠিক মাঝখানে। ঘন ঘন এরোপ্লেন উড়ে যাচ্ছে মাথার ওপর দিয়ে। শুনছি কামান নির্ঘোষ। সেসব কামান এ যুগের কামানের চেয়েও অনেক বেশি বিধ্বংসী, সে যুগের যুদ্ধবিমানদের ক্ষমতা যে কদ্দূর, সে হিসেবও কেউ রাখে না, তৈরি হওয়ার পর থেকে কোনও দিন কাজে তো লাগেনি...

আমার সঙ্গিনী কাঁদছিল। আমি পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। পথকষ্ট আর সইতে পারছে না–কাঁদুক। একটু আগে মিনতি করেছিল। আমি রাজি হইনি। যুদ্ধে আমি নেই–থাকবও না। অনুতাপ? একেবারে নেই। মৃত্যু? আসুক-না।

মাথার ওপর ফাটল একটা গোলা। দূরে কয়েকটা বিমান জ্বলতে জ্বলতে ফেটে গেল শুন্যে। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, সঙ্গিনী উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়েছে আমার দিকে। তারপরেই মুখ থুবড়ে পড়ল মাটিতে।

কাছে গেলাম। হৃৎপিণ্ড এ ফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেছে গোলার টুকরোয়।

তারপর?

পাঁজাকোলা করে তাকে বয়ে আনলাম কতকগুলো পুরানো মন্দিরের মাঝে একটা চত্বরে–কবরখানা বলেই মনে হল। পাথরের ওপর তাকে শুইয়ে পাশে বসে রইলাম পাথরের মতো। টিকটিকি আর গিরগিটি ছুটোছুটি করতে লাগল আশপাশে।

এইভাবেই কতক্ষণ বসে ছিলাম জানি না। স্বপ্ন থেকে ফিরে এসে দেখেছিলাম, বসে রয়েছি অফিসঘরে। কীভাবে যে ঘুম থেকে উঠে জামাকাপড় পালটে অফিসে এসেছি, কিছু মনে নেই। চিঠিপত্র দেখে গেছি যন্ত্রের মতো–কী লেখা ছিল কাগজপত্তরে–তা-ও মনে নেই।

আবার যখন ফিরে গেলাম স্বপ্নের মধ্যে–দেখেছিলাম, একদল সৈন্য এগিয়ে যাচ্ছে মন্দির চত্বরের দিকে–আমি বসে আছি বাইরে। বাধা দিয়েছিলাম। আমার ভাষা তারা বোঝেনি। আমিও তাদের ভাষা বুঝিনি। একজন তলোয়ারধারীর হাত চেপে ধরতেই

তলোয়ারটা আমূল ঢুকিয়ে দিয়েছিল আমার বুকে।

না। কোনও যন্ত্রণা অনুভব করিনি। অপরিসীম বিস্ময়বোধে শুধু আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিলাম।

লন্ডন এসে গেছে। ল্যাম্পপোস্টের পর ল্যাম্পপোস্ট সাঁত সাঁত করে পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। গোধূলির রক্তাভা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। গতি কমে আসছে ট্রেনের।

আর স্বপ্ন দেখেননি? প্রশ্ন করেছিলাম বিষম উৎকণ্ঠায়।

দেখেছি। শুধুই দুঃস্বপ্ন। মন্দিরের ওদিকে রয়েছে আমার সঙ্গিনী। কাছে যেতে পারছি না কিছুতেই।

কুলির হাঁক শুনলাম বাইরে।